PRANTIK GABESHANA PATRIKA
MULTIDISCIPLINARY-MULTILINGUAL-PEER REVIEWED-REFERRED-BI-ANNUAL DIGITAL RESEARCH JOURNAL
WEBSITE: SANTINIKETANSAHITYAPATH.ORG.IN
VOLUME-1 ISSUE-1 JULY 2022

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত ‘কবিকঙ্কণ-চণ্ডী’ কাব্য

শেলি সাহা

LINK: https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2022/12/শ্রীকুমার-বন্দ্যোপাধ্যায়ের-সম্পাদিত-‘কবিকঙ্কণ-চণ্ডী-কাব্য_শেলি-সাহা-6.pdf

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সমালোচনামূলক গ্রন্থ রচনা করে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর সম্পাদিত ‘কবিকঙ্কণ-চণ্ডী’ গ্রন্থে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর বিভিন্ন কাব্যবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মুকুন্দরামের সমসাময়িক কবি দ্বিজ মাধবের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা মুকুন্দরামের কাব্যে বাস্তবরসের প্রসার দেখানোর চেষ্টা আছে।

সূচক শব্দ : মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গাল, চণ্ডী, কাব্য, কবি, সাহিত্য, বাস্তবতা, ধর্ম, তুলনা, মৌলিকত্ব, যুদ্ধ ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্য বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত। উত্তরোত্তর সাহিত্যের প্রসার ঘটেই চলেছে। বিভিন্ন সাহিত্যিকেরা তাঁদের সাহিত্যের দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন এবং করে চলেছেন। সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনাকে নানা পণ্ডিত, মনীষী, সমালোচক, প্রাবন্ধিক তাঁদের মূল্যবান সমালোচনার দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত ও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। অবশ্য এর জন্য প্রয়োজন সাহিত্যের অনুশীলন। আর এই অনুশীলনের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘বঙ্গাবীণা’ কাব্যের ‘পরিচয়’ অংশে বলেছেন — “সাহিত্য বিজ্ঞানের মতো নয়। তার ঝুঁটা-সাঁচ্চা বিচার, যুক্তির দ্বারা সম্ভব হলে ভাবনা থাকত না; রুচি ছাড়া আর কোনো কষ্টি পাথর বা মানদণ্ড তার নেই। ...একটিমাত্র উপায় হচ্ছে, সাহিত্য অনুশীলনের সাহায্যেই সাহিত্যরুচির বিস্তার সাধনা করা।”[১] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অনুশীলন ও রুচিবোধ ছিল যা তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন সাহিত্যানুরাগী বিভিন্ন সময়ে চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের আলোচনা করেছেন — দীনেশচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। তাঁদের কাব্যের সমালোচনার প্রধান কতগুলি বৈশিষ্ট্য — ব্যক্তি মুকুন্দরামের পরিচয় উদঘাটন, কাব্যরচনার সময় ও আবির্ভাবকাল নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরনের প্রথাসিদ্ধ আলোচনায় যাননি। যেমন — কী জন্য দেবী চণ্ডীর প্রাধান্য সমাজে দেখা গেল, এর আগে দেবী কীরূপে ছিলেন, হঠাৎ মানুষ কেন এই দেবীর উপর আস্থা রাখতে আরম্ভ করল, বিভিন্ন মঙ্গালকাব্যের শাখার সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গালের তুলনা করে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের বিশেষত্ব দেখানো ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বক্তব্য

নিয়ে এলেন এই গ্রন্থের আলোচনার মধ্য দিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য সমালোচকদের সঙ্গো শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষ্য করায় বিষয়টি পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

মুকুন্দরামের ‘কবিকঙ্কণ-চণ্ডী’ বইটি সম্পাদনা করেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী। বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু এর ভূমিকা-অংশ লিখেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ি অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সমালোচনার রচনাকাল ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ ২০০২ অনুযায়ী ৩৫ পৃষ্ঠার দীর্ঘ আলোচনাকে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকা-সহ মোট ১০টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু অধ্যায় বিভাজনে কোনো শিরোনাম দেননি। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর আলোচনায় আশুতোষ ভট্টাচার্যের বই এবং সুধীভূষণ ভট্টাচার্যের বই পাঠ করার পরামর্শও দিয়েছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ভূমিকায় কেবল নয় অধ্যাপক মহাশয় তাঁর ‘বঙ্গাসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ বইটিতেও অংশত চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের আলোচনা করেছেন। এবার আলোচনার মূল প্রসঙ্গো আসা যাক। বিষয় ও আলোচনার উপর ভিত্তি করে আলোচনার সুবিধার্থে তাঁর আলোচনাকে অধ্যায় অনুযায়ী শিরোনাম দিয়ে আলোচনা করা হলো —

১

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের অবস্থান ও মাতৃদেবতার প্রাধান্য

গ্রন্থটির আলোচনার প্রারম্ভে সম্পাদক মহাশয় জানিয়েছেন তিনি এমন একটি বিষয় বেছে নিয়েছেন যা সংকীর্ণ ধর্মগত প্রয়োজন ছাড়িয়ে সার্বভৌম স্বীকৃতি লাভ করেছে। সমসাময়িক কবি দ্বিজ মাধবের সঙ্গো মুকুন্দরামের তুলনা করে মুকুন্দরামের কাব্যের মৌলিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। দেবী চণ্ডী পৌরাণিক কি আর্য দেবতা বা দেবীর উদ্ভব সম্পর্কিত আলোচনা নয়, তিনি বলেছেন সমাজে মাতৃদেবীর প্রাধান্যের কথা। বেদ ও উপনিষদে পুরুষ দেবতা আর তন্ত্রে নারী দেবতার প্রাধান্য। সেইজন্য — ‘‘তন্ত্রশাস্ত্র শক্তির অসীম মহিমা কীর্তন করিয়া ও শক্তিপূজার নানা দুরূহ সাধনপ্রণালী নির্দেশ করিয়া এই প্রবণতার সূত্রপাত করে।’’[২] আর এই প্রভাব বাঙালির মনে বদ্ধমূল করতে সহায়তা করে বৈষ্ণব-দর্শনের শ্রীরাধাতত্ত্ব ও পদাবলি সাহিত্যের শ্রীরাধার স্তবস্তুতি ও অসীমের ব্যঞ্জনা। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, তন্ত্রশাস্ত্রের ধ্যানে এবং ভাস্কর্যশিল্পের শিলামূর্তিতে যে দেবীকে আমরা পাই, ভক্ত ধ্যানের মধ্যে আর সাহিত্য-শিল্প তাকে ধ্যান-লোক থেকে প্রত্যক্ষ সৌন্দর্যলোকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। একসময়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসায় বৌদ্ধ উপাস্য ধর্মতত্ত্বকে হিন্দু দেবদেবীর উপর আরোপ করার চেষ্টায় দেবীর ভীষণ ও মধুর রূপ এক হয়ে গেল। মুসলমান যুগে দেবীর এই গুণের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা দেখা গেল। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কালকেতুর প্রতি দেবীর পক্ষপাতিত্বের কথা বলে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

২

যুগজীবনের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাবন্ধিকের মূল বক্তব্য হলো — দেবী চণ্ডী ও ধর্মঠাকুর ‘শমরস’ প্রধান দেবতা। দেবী চণ্ডীর পৌরাণিক রূপটি আর্য ধর্মের সঙ্গো সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু পৌরাণিক রূপের মধ্যে বাঙালির মানস বৈশিষ্ট্যের প্রভাব পড়ায় দেবীর দয়াময়ী অন্নপূর্ণা মূর্তির প্রাবল্য দেখা যায়। এই মাতৃরূপের জন্য চণ্ডীপূজার বিরোধিতা করা হয় না। কিন্তু ধর্মমঙ্গালের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। ধর্মঠাকুরের মধ্যে বাইরে থেকে আসা আগুন্তকের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। মনসামঙ্গালের ক্ষেত্রেও এর একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি। মনসামঙ্গাল কাব্যে মনসাদেবীকে জোর করে দেবীর পর্যায়ে উন্নত করা হয়েছে। আমাদের প্রচলিত সংস্কার ও ঔচিত্যবোধের দিক থেকে আমরা তা মেনে নিতে পারি না। ভয়ের পথ ধরেই মনসা দেবীর আবির্ভাব। চাঁদ সদাগর ও বেহুলা চরিত্র সৃষ্টিতে মনসামঙ্গালের কবিদের কৃতিত্ব অনেক বেশি। বীর কালকেতুর ধানের গোলায় লুকোনোর প্রসঙ্গো শ্রীকুমারবাবু দেখিয়েছেন, চাঁদ সদাগরের নৈতিক মূল্যবোধের দৃঢ়তা। এবং ফুল্লরা ও খুল্লনার সঙ্গো তুলনায় বেহুলা চরিত্র সৃষ্টিতে মনসা মঙ্গালের কবিদের শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্ত তা সত্তেও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই তুলনার মধ্য দিয়ে যে কথা

বলতে চান তা হলো — ‘‘মনসামঙ্গাল কাব্যপর্যায়ে মুকুন্দরামের মতো অনবদ্য শিল্পসুষমাসম্পন্ন, যুগপ্রতিনিধি কবি নাই; কিন্তু মুকুন্দরাম যুগজীবনের যে সমতল ভূমিতে স্বচ্ছন্দ গতিতে বিচরণ করিয়াছেন, মনসামঙ্গালের কবিরা তাঁহার ঊর্ধ্ব ও অধোদেশে প্রসারিত উচ্চাবচ ভূসংস্থানে আয়াসসাধ্য, অসম পদক্ষেপে এক আসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।’’[৩]

৩

দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব

তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যধারার দুজন কবি দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরামের কাব্যে বৈষ্ণবভাব ও কাব্যরীতির প্রভাব আছে। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার সঙ্গো সম্পর্কিত কোনো পদ লিখতে গিয়ে তিনি পদাবলি সাহিত্যের অনুকরণে পদ রচনা করেছেন। কিন্তু দ্বিজ মাধব সবসময় এই রকম পদ রচনায় সঙ্গাতি রক্ষা করতে পারেননি। অনেক সময় তা বিসদৃশ্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে তিনি বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব অনেকটা কম। এর কারণ চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেম ধর্মের প্রতি অনাস্থা বা পদাবলি সাহিত্যের মাধুর্যের প্রতি ঔদাসীন্য নয়। এর কারণ তাঁর পরিণত শিল্পজ্ঞানের পরিচয় ও বিষয় সম্বন্ধে সূক্ষ্ম জ্ঞান। নায়িকার রূপবর্ণনায় বা দেবী চণ্ডীর সৌন্দর্য বর্ণনায় বৈষ্ণব আদর্শের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। আবার কতগুলি ক্ষেত্রে যেমন — মুকুন্দরামের চণ্ডীর মধ্যে শক্তিরূপিণী প্রকৃতিটি পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। সেইজন্য মুকুন্দরামের পক্ষ সমর্থন করে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘‘গ্রন্থের অন্যান্য অংশে যে কবি যুগপ্রচলিত বৈষ্ণবপ্রভাবে আত্মসমর্পণ করেন নাই, তাহার কারণ তাঁহার পরিণত শিল্পজ্ঞান ও বিষয়ের স্বভাবধর্ম-সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর সঙ্গাতিবোধ।’’[৪]

৪

বাস্তবরসের প্রসার

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাবন্ধিক আলোচনা প্রসঙ্গো আখ্যায়িকার স্বভাবধর্ম আবিষ্কারে ও বাস্তবতা প্রসারের উপর আলোচক শ্রীকুমারবাবু জোর দিয়েছেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের মতো এই অধ্যায়ের আলোচনা প্রসঙ্গো এসেছে মুকুন্দ চক্রবর্তী ও কবি দ্বিজ মাধবের রচনার কথা। দুই কবির দুই কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গো চণ্ডীমঙ্গাল আখ্যানে বাস্তব রস প্রবর্তনের ছায়া পরিলক্ষিত হয়। তাই আখ্যানে বাস্তব রস প্রবর্তনের কৃতিত্ব মুকুন্দরামের নয়। এর কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন যুগধর্মের প্রেরণা। মুকুন্দরাম ও দ্বিজ মাধবের সময় থেকেই আখ্যানের মূলধারা ও বস্তুনিষ্ঠা সম্বন্ধে চণ্ডীমঙ্গাল কবিগোষ্ঠীর মধ্যে একটা সর্বস্বীকৃত প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গালকাব্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গো চন্ডীমঙ্গালের তুলনা করে এর মধ্যে বাস্তবতার ক্রমিক প্রসার দেখানোর চেষ্টা করেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, ‘‘চণ্ডীমঙ্গাল-কাব্যগুলিতে কবি-মানস-রূপান্তরের একটি বৈপ্লবিক ইতিহাসের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে।’’[৫] তিনি আরও বললেন, ‘‘চণ্ডীমঙ্গালে বাস্তবরস-স্ফুরণের আপেক্ষিক উৎকর্ষ ও প্রাচুর্যের কারণ ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মানবিক আবেদনের মধ্যেই নিহিত।’’[৬] মঙ্গালকাব্যের প্রাচীনতম রূপ ধর্মমঙ্গালে ধর্মঠাকুরের মধ্যে এই মানবিক আবেদন স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেনি। মনসামঙ্গাল কাব্যের জগত আমাদের পরিচিত হলেও আমাদের বাস্তববোধকে তীক্ষ্ণতর করতে পারে নি। মধ্যযুগের সাহিত্যে বাস্তববোধের স্ফুরণ একমাত্র চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যেই দেখা যায়।

৫

চণ্ডীমঙ্গালে বাস্তবতা

পঞ্চম অধ্যায়ে লেখক চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে বাস্তবতার অন্বেষণ করেছেন। এই সূত্রে প্রাবন্ধিক বলেছেন, মঙ্গালকাব্যের প্রচলিত কাহিনি অবলম্বনে কবিদের কাব্য রচনা করতে হয়। তাই বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে মৌলিকতা নেই। মঙ্গালকাব্যের কবি মুকুন্দরামও একই পথের পথিক। প্রাবন্ধিক তাঁকে বাস্তবতার প্রবর্তক বলেননি। কিন্তু তাঁর কাব্যে যে বাস্তবতার প্রকাশ তা গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন। এবং এই

আলোচনা প্রসঙ্গোই দ্বিজ মাধবের তুলনায় মুকুন্দরামকে ‘আদর্শবাদী’ কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। এবং তিনি বলেছেন কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্যে কেবল বস্তুরসের সঞ্চার করেননি, বাস্তবরস পরিবেশনেও নৈপুণ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি ইংরেজি সাহিত্যের বাস্তবরসের কবি চসারের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিতে মুকুন্দরামের ‘বস্তুনিষ্ঠতা’ চসারের সমগোত্রীয়। তাই তিনি মুকুন্দরামকে ‘দুঃখবাদী কবি’ আখ্যায় ভূষিত না করে ‘জীবনরসরসিক’ বলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কারণ মুকুন্দরাম দুঃখকে খুব বড় করে দেখেননি। প্রাবন্ধিকের মতে, ‘ফুল্লরার বারোমাস্যা’য় দুঃখ কাহিনি বর্ণনা সমালোচকের দৃষ্টিতে দারিদ্র্যের প্রতি সহানুভূতি। কবির অপত্য স্নেহ প্রধানত অবলম্বন করেছে কালকেতু-ফুল্লরা, হর-গৌরীকে, তাদের জীবনের দারিদ্র্যকে নয়। কাহিনি বর্ণনার ভাবগত প্রেরণা করুণরস নয়, সহানুভূতি লাভ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “আমরা তাঁহার অভাবের তালিকা দেখিতেছি, তাঁহার দুঃখজয়ী মনোভাবকে ঠিক গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।”[৭]

৬

দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরামের কাব্যে বাস্তবতাবোধের তুলনা

ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রাবন্ধিকের মূল বক্তব্য — দ্বিজমাধব বস্তুসঞ্চয়ের মধ্যে গতি আনতে পারেন নি। সেই জন্য বস্তুর প্রাচীর ভেদ করে কবির চিত্তের আনন্দ ও হিল্লোল আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যে বহু প্রমাণ আছে যা আমাদের বাস্তবতার দিকে নিয়ে যায়, সহজ সরলভাবে আমাদের প্রাণ স্পর্শ করে। যেমন — গর্ভবতী ব্যাধরমণীর সাধভক্ষণের আয়োজনে, কালকেতুর শৈশব-জীবনের চিত্রণে, বিবাহের কৌতুকরস ও প্রাকৃত নর-নারীর সহজ আনন্দ ইত্যাদি বর্ণনায়। এছাড়াও কালকেতুর পশু শিকারের কাহিনিকে অবলম্বন করেও মুকুন্দরামের কাব্যরস, হাস্য-রসিকতা ও রূপকের ব্যবহারে দক্ষতা দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিজ মাধবের কাব্যে পশু-জগতের এই জীবন চাঞ্চল্যের খানিকটা পরিচয় পাওয়া গেলেও মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে প্রাণের গভীর অনুভূতি থেকে এই চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর সঙ্গো দ্বিজ মাধবের কাব্যের পশুজগতের কাহিনির তুলনা হয় না। অপরদিকে মুরারি শীল ও ভাঁড়ু দত্তের প্রসঙ্গো ‘ধার শোধ’-এর যে কাহিনি বর্ণিত আছে সেখানে মুকুন্দরামের কাব্যে প্রাণের ঝলক লক্ষ্য করা যায়, সেই তুলনায় দ্বিজমাধবের আখ্যানভাগ অনেক নীরস ও সংক্ষিপ্ত। প্রাবন্ধিকের মতে উভয় কবির কাব্যেই নগরপত্তন-ব্যাপারে, নতুন শহরে প্রজা বসানোর জন্য যে বিনীত বাসনা তা বাস্তববোধের পরিচায়ক। মুকুন্দরামের কাব্যে দৈব প্রেরণা অপেক্ষা অর্থনৈতিক কারণই প্রজাদের দেশত্যাগের প্রবল প্রেরণা যুগিয়েছিল। এই প্রসঙ্গো প্রাবন্ধিক বলেছেন, “মুকুন্দরামের কাব্য মনোযোগ দিয়া পড়িলে বোঝা যায় যে, সমসাময়িক সমাজের বাস্তব প্রেরণাই কেমন করিয়া দৈবপ্রভাবের সার্বভৌম প্রসারের মধ্যে ধীরে ধীরে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে।”[৮] চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের বিভিন্ন জাতি ও ব্যবসায়বৃত্তির প্রতিনিধি কালকেতু নির্মিত নতুন শহরে বাস করতে এসেছিলেন। প্রজাদের মধ্য দিয়ে ষোড়শ শতকের সমাজ জীবনের তথ্যসমৃদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক ছবি পাওয়া যায়। এই চিত্র মুকুন্দরামের কাব্যে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যে তা অনেকটাই সংক্ষিপ্ত। নবাগত-মুসলমান-সমাজের যে চিত্র পাই তা সত্যানুগ ও সহৃদয়। এক্ষেত্রেও মুকুন্দরামের বর্ণনা আরও বেশি বিস্তৃত ও বাস্তবানুগ।

৭

দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরামের ভাঁড়ু দত্তের তুলনামূলক আলোচনা

সপ্তম অধ্যায়ের মূল বিষয় দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরামের ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা । এই আলোচনা প্রসঙ্গো প্রাবন্ধিক বলেছেন দুই কবিরই ভাঁড়ু দত্ত চরিত্র বিষয়ক কাহিনি একে অপরের পরিপূরক। কারণ দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্যে ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রের ঠকামি, মিথ্যা অজুহাত ইত্যাদি যেমন বাস্তবসম্মত করে ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি চণ্ডীমঙ্গালের পরবর্তী কবি মুকুন্দরাম তাঁর ভাঁড়ু দত্ত চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সরস ও ব্যঙ্গোর তির্যক ব্যঞ্জনার দ্বারা নিজের কবিসত্তার ‘তীক্ষ্ণ সাহিত্যিক গুণসমৃদ্ধ’তার পরিচয় দিয়েছেন। চণ্ডীমঙ্গালে ভাঁড়ু দত্ত জীবন্ত চরিত্র যা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বিরল। দুই কবি নিজস্ব সৃষ্টি প্রতিভার দ্বারা এই বিরল গোত্রের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এর

প্রধান কারণ হিসেবে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন তৎকালীন যুগের নবোন্মেষিত বাস্তব চেতনা। প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিতে — "দ্বিজ মাধবেও ভাঁড়ু যথেষ্ট সজীব; কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যে সে আরও গভীরভাবে পরিকল্পিত ও নিগূঢ় প্রাণরসে অধিকতর সঞ্জীবিত।"[৯]

৮

যুদ্ধ বর্ণনা

মধ্যযুগের কাব্যে যুদ্ধবর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের অভিমত পোষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবি কৃত্তিবাস ও কাশীদাস গতানুগতিকতার যে ধারা বহন করেছিলেন মঙ্গলকাব্যের কবিরা সেই গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করে কখনো কখনো বাস্তবতার আশ্রয় নিয়েছেন। কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণে অতিরঞ্জন প্রবণতা ও অতিপ্রাকৃত ঘটনাসংস্থান দেখা যায়। পরবর্তী পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য গুলোতে একই ধারা অনুসৃত হয়েছে। তবে মঙ্গলকাব্য গুলোতে বাস্তবতা সম্পূর্ণরূপে অতিপ্রাকৃতের অধীন নয়। যুদ্ধ বর্ণনায় কিছু কিছু স্বতন্ত্রতার চিহ্ন দেখা যায়। সেইজন্য মঙ্গলকাব্যের লেখক বাস্তবতার দাবি করতে পারেন। শ্রীকুমার বলেছেন, "কবি সেনাপতির মত নিয়ন্ত্রণ না করিয়া একেবারে সৈনিকের মত ধূলাকাদা মাখিয়া যুদ্ধের প্রতি তাঁহার শিশুক্রিড়ামূলক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন।"[১০] এই যুদ্ধের ক্ষেত্রে দ্বিজ মাধব বেশি বাস্তবপ্রবণতা দেখিয়েছেন। দ্বিজ মাধবের কাব্যে দেবী চণ্ডী প্রথমে মঙ্গলদৈত্যকে বিনাশ করেছেন, কলিঙ্গ এবং কালকেতুর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যে দেবী চণ্ডী, কলিঙ্গ এবং কালকেতুর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অতিমানবিক শক্তির প্রয়োগ করেছেন। দ্বিজ মাধবে কালকেতু মুকুন্দরামের কালকেতুর মতো স্ত্রীর পরামর্শে ধানের গোলায় লুকিয়ে নিজের বীরত্বে কলঙ্ক লেপন করেননি। দ্বিজ মাধবের কাব্যে কালকেতু নিরস্ত্র হয়ে অতর্কিতভাবে বন্দী হয়েছে।

৯

মুকুন্দরামের কাব্যে মৌলিকতা

কবি মুকুন্দরামের সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, "মুকুন্দরাম রোমান্টিক কবি ছিলেন না, জীবনের সূক্ষ্ম, অপ্রত্যক্ষভাবব্যঞ্জনা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তবরসের কবি এবং এক সুপ্রতিষ্ঠিত ধারার বাহন।"[১১] মঙ্গলকাব্যের কাব্যধারায় মুকুন্দরাম প্রথম 'শিল্পবোধ ও চারুত্বসৃষ্টি'র পথ প্রদর্শক। শুধু তাই নয় কবি 'বারমাস্যা'র দুঃখবর্ণনার ক্ষেত্রেও মানব জীবনের নানা রকম বাস্তব জীবনের চিত্রের দ্বারা উক্ত বর্ণনাকে কাব্যের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এবং প্রত্যক্ষ মানব জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে তুলেছেন। ভারতচন্দ্রের সঙ্গে মুকুন্দরামের তুলনা করে বলেছেন, "ভারতচন্দ্রে যে ছন্দঃকুশলতা ও মার্জিত ভাষানৈপুণ্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে, তাহার প্রথম সূচনা মুকুন্দরামে; তফাৎ এই যে, মুকুন্দরামের সরস কৌতুক ও সরল গ্রাম্যজীবনের স্বাভাবিকতা ভারতচন্দ্রে রাজসভার কৃত্রিম আবহাওয়ায় শ্লেষপ্রধান, আক্রমণশীল মনোভাবে পরিণত হইয়াছে।"[১২]

১০

গ্রন্থ বিবরণ

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দশম অধ্যায়ে বিশ্বপতি মহাশয়ের সহযোগিতার কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। মূল চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে যে লিপিকরপ্রমাদ ছিল তা পরিশুদ্ধ করে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠের উপযোগী করে তুলেছেন। এবং ছাত্র-ছাত্রী ও পাঠকের সুবিধার্থে কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থ সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথ মিত্র ও বিশ্বপতি চৌধুরীর কাছে শ্রীকুমারবাবুকে ঋণ স্বীকার করতে দেখা যায়। পরিশেষে বলা যায় দুই প্রাবন্ধিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করেছে।

১১

আমাদের মন্তব্য

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' কাব্যের আলোচনার প্রারম্ভেই মঙ্গালকাব্য ধারার দুই বিশিষ্ট কবি মাণিক দত্ত ও দ্বিজ মাধবের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মাণিক দত্তের রচিত পুঁথি পাওয়া যায় না সেইজন্য শ্রীকুমারবাবু সমসাময়িক কবি দ্বিজ মাধবের কাব্যের সঙ্গো মুকুন্দরামের কাব্যের তুলনা করে মুকুন্দরামের কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি চণ্ডীমঙ্গালের দেবী চণ্ডীর উদ্ভব, দেবী আর্য কি অনার্য কিনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনায় না গিয়ে সরাসরি চলে এসেছেন সমাজে মাতৃদেবীর প্রাধান্য এলো কী করে এবং এক্ষেত্রে তন্ত্র সাধনা ও বৈষ্ণবদর্শন ও পদাবলি সাহিত্যের উল্লেখ করেছেন। তন্ত্রে মাতৃদেবীর প্রাধান্যের কথা অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' বইতে পাই।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মুকুন্দরামের কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, 'মুকুন্দরামের মতো অনবদ্য শিল্পসুষমাসম্পন্ন, যুগপ্রতিনিধি কবি নাই।'[১৩] একই সাথে তিনি মনসামঙ্গালের সঙ্গো চণ্ডীমঙ্গালের তুলনা করে দেখিয়েছেন চাঁদ সদাগর চরিত্র সৃষ্টিতে, বেহুলা চরিত্রের রূপায়ণে মনসামঙ্গালের কবিদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হলেও বাস্তবতার দিক থেকে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গাল 'যুগজীবনের যে সমতল ভূমিতে' বিচরণ করে তা মনসামঙ্গালে পরিলক্ষিত হয় না। কারণ মনসামঙ্গাল কাব্যে ভয় মিশ্রিত ভক্তির গান শোনা যায়। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মুকুন্দরামের কাব্যে এই বাস্তবতার প্রতিষ্ঠা করেছেন বিভিন্ন প্রসঙ্গো দ্বিজমাধবের কাব্যের সঙ্গো মুকুন্দরামের কাব্যের তুলনার মধ্য দিয়ে। যেমন — দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দরাম দুই কবির চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যেই বৈষ্ণব প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও দ্বিজ মাধবের কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব অনেক সময় সাদৃশ্যমূলক নয়। অপরদিকে মুকুন্দরামের কাব্যে এই প্রভাব সংযত। কারণ মুকুন্দরামের স্বভাবধর্মে ছিল বিষয় সম্পর্কে সূক্ষ্মতর সঙ্গাতিবোধ।

প্রাবন্ধিক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বাস্তবতা প্রসারের দিক থেকে মুকুন্দরাম দ্বিজ মাধবের থেকে শ্রেষ্ঠ। বিষয় নির্বাচনে মৌলিকতা দেখানোর সুযোগ যেমন চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যধারার কবিদের নেই, তেমনই পারিপার্শ্বিক বাস্তবতাকে তুলে ধরার কৃতিত্বও তাঁদের প্রাপ্য নয়। মুকুন্দরামের কাব্যে বাস্তবতার প্রসার কতটা? এক্ষেত্রে তিনি দ্বিজ মাধবের সঙ্গো তুলনা করে বলেছেন — "বরং কোন কোন স্থলে দ্বিজ মাধবের সঙ্গো তুলনায় মুকুন্দরাম অধিকতর আদর্শবাদী।"[১৪] কিন্তু তা হলেও মুকুন্দরামের কাব্যের বিশেষত্ব, "বাস্তবরসের পরিবেশন নৈপুণ্যে।"

চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের বাস্তবতা নিয়ে মতানৈক্যের অন্ত নেই। সমালোচকেরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে তাঁদের নিজস্ব মত স্থাপন করেছেন। যেমন, বিশিষ্ট সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর মতে, "কিন্তু আমরা কি মুকুন্দরামের তৎকালীন চিত্র পাই না? চিত্রই পাই, কাব্য নয়। তৎকালীন চিত্র পাই, চিরকালীন কাব্য নয়। এই তৎকালীনতার জন্য মুকুন্দরাম অমর হইয়া আছেন।"[১৫] সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কাব্য: স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট' প্রবন্ধে বলেছেন — "আমানি খাবার গর্ত দেখাইয়া দারিদ্র্য সপ্রমাণ করার মধ্যে কতকটা নাট্যনৈপুণ্য থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কাব্যরস কোথায়? দুটো ছত্র, কবিত্বে সিক্ত হইয়া উঠে নাই; ইহার মধ্যে অনেকখানি আমানি আছে, কিন্তু কবির অশ্রুজল নাই।"[১৬] সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত অন্যান্য সমালোচক যাঁরা মঙ্গালকাব্যের আলোচনা করছেন তাঁদের সমালোচনার পরিসর বিস্তৃত। কারণ শ্রদ্ধেয় সমালোচক মূলত দুটি কাব্য, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গালের সঙ্গো দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গালের তুলনার মধ্য দিয়ে বাস্তবতার প্রসার দেখিয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য সমালোচকেরা ভারতচন্দ্রের কাব্যের সঙ্গো মুকুন্দরামের কাব্যের তুলনা করে বাস্তবতার ভিত্তিভূমিকে জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবিকঙ্কণের কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে মূল বিষয় বাস্তবতাকে প্রধান ভিত্তিভূমি হিসেবে দেখিয়েছেন এবং এই ক্ষেত্রে তিনি দ্বিজ মাধবের কাব্যের সঙ্গো মুকুন্দরামের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর পরবর্তী মঙ্গালকবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে সমাজ

বাস্তবতার উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এই সমালোচনা লিখছেন তার বহু পূর্বেই ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গাল' কাব্য প্রকাশিত হয়। সমাজ জীবনের প্রকৃত বাস্তবতাবোধ ভারতচন্দ্রের কাব্যে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। মঙ্গালকাব্যের প্রধান ধারায় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গাল' কাব্য অন্যতম স্থান লাভ করেছে। বাংলা মঙ্গালকাব্য ধারার প্রধান কবি ভারতচন্দের কাব্যে যে জীবন যন্ত্রণার ছবি প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনায় মুকুন্দরামের কাব্যে বাস্তবতা খানিকটা ম্লান। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র নবম অধ্যায়ে এসে ভারতচন্দ্রের উল্লেখ করেছেন। সমালোচনার ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনার মূল কথা হলো "তুলনার জন্য উভয়ের মধ্যে সামান্যধর্মের ঐক্য চাই।"[১৭] প্রাবন্ধিক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থের প্রথমেই জানিয়েছিলেন আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি দ্বিজ মাধবের কাব্যকে নির্বাচন করেছেন। কিন্তু যদি দ্বিজ মাধবের কাব্যের সাথেই ভারতচন্দ্রের কাব্যকে স্থান দিতেন তাহলে সমসাময়িকের যে সংকীর্ণতাবোধ তার উর্ধে এসে মঙ্গালকাব্য ধারার তিন বিশিষ্ট কবি দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্রের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করলে সেটি সমালোচক মহাশয়ের হাতে একটি রসজ্ঞ সমালোচনা হতো। এবং শুধু দ্বিজ মাধবের সঙ্গো নয় মুকুন্দের সঙ্গো ভারতচন্দ্রের কবিসত্ত্বার, বাস্তববোধের, শিল্প নৈপুণ্যতার পরিচয় পাওয়া যেত এবং আমরা আরও বেশি ঋদ্ধ হতাম।

প্রাবন্ধিক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমালোচনায় মুকুন্দরামের কাব্যে বাস্তবতা খুঁজেছেন। যুদ্ধ বর্ণনার ক্ষেত্রে, কবি মুকুন্দরামের কাব্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে বা অন্যান্য মঙ্গালকাব্যের সঙ্গো তুলনার ক্ষেত্রে, বস্তুর প্রাচীর ভেদ করে বাস্তবতার প্রসার কতটা হয়েছে তা দেখিয়েছেন। যার ফলে বিষয়-বৈচিত্র্য হারিয়ে গেছে। এমনকি মুকুন্দরামের ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও। ভাড়ুঁ দত্তের চরিত্রের আলোচনায় দ্বিজ মাধবের ভাঁড়ুর সঙ্গো তুলনা করে দেখিয়েছেন মুকুন্দরামের ভাঁড়ু কতটা বাস্তব রসে পুষ্ট। কিন্তু ভাড়ুঁ দত্তের চরিত্রের অন্যান্য গুণাবলী সমালোচকের সমালোচনায় অনুপস্থিত। তিনি যদি বাস্তবতার প্রসারতা দেখানোর সঙ্গো সঙ্গো মুকুন্দ-সাহিত্যের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করতেন তবে বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য সমালোচকদের সমালোচনার তুলনায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা আরোও বেশি চিত্তগ্রাহী হত এবং আমরা সমৃদ্ধ হতাম।

চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের আলোচনা একটি বহু বিতর্কিত বিষয়। ভিন্ন ভিন্ন সমালোচক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাব্যের সমালোচনা করেছেন। যেমন — প্রাবন্ধিক রামগতি ন্যায়রত্নের ভাষায় — "অন্যের কথা দূরে থাকুক, কবিত্ববিষয়ে ভারতচন্দ্রের যে, এত গৌরব এবং আমাদেরও ভারতচন্দ্রের প্রতি যে, এত শ্রদ্ধা আছে — কিন্তু চণ্ডীপাঠের পর অন্নদামঙ্গাল পাঠ করিলে, সে গৌরব ও সে শ্রদ্ধার অনেক হ্রাস হইয়া যায়।"[১৮] আবার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেছেন — "কবিকঙ্কণের অন্য একবিধ গৌরব আছে।... বঙ্গোর কুঁড়ে ঘরে দৈনন্দিন যে সহিষ্ণুতার পরীক্ষা হয়, নিত্য প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলেই আত্মোৎসর্গের যে মন্ত্র যপ করিয়া বঙ্গানারীগণের গৃহকর্মে মনোনিবেশ করিতে হয়, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ও সেই মন্ত্র গূঢ়সহিষ্ণুতার সহিত অভ্যাস করা সকলস্থলে সম্ভবপর নহে, — এই স্থানে মুকুন্দ কবির নির্বিরোধ রাজত্ব।"[১৯] অপরদিকে শ্রদ্ধেয় সমালোচক প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে বলেছেন — "মুকুন্দরামের প্রধান দোষ গ্রাম্যতা, কি ভাবে, কি ভাষায়, কি চরিত্র অঙ্কণে; অবশ্য কল্পনায় নয়, তার কারণ কল্পনাশক্তি তাঁহার স্বল্প। সাহিত্যে যে urbanity আমাদের আদর্শ, পুরাতন কবিদের একমাত্র ভারতচন্দ্রের মধ্যে তাহা পাই; মুকুন্দরাম sub-urbanityতেও পৌঁছিতে পারেন নাই।"[২০] যে সময়ে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন সে সময়ে রবি ঠাকুরের বিভিন্ন আলোচনাও বেরিয়ে গেছে। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধেও মুকুন্দরামের কাব্যের আলোচনা করেছেন নানা ভাবে। যেমন — 'বাঙালি কবি নয়' প্রবন্ধে বলেছেন — "কবকঙ্কণ মহাকাব্য নহে। আয়তন বৃহৎ হইলেই কিছু তাঁহাকে মহাকাব্য বলা যায় না।"[২১] এবং আবার একথাও বলেছেন — "কবিকঙ্কণের কাব্য অতি সরস কাব্য। কিন্তু উহা লইয়াই আমরা বাঙালি জাতিকে কবি জাতি বলিতে পারি না।"[২২] কিন্তু অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় যে সমস্ত বিষয় বিতর্কিত সেই বিষয়গুলো সুচতুরভাবে শুধু এড়িয়ে যাননি, সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্যও করেননি। শ্রদ্ধেয় সমালোচক মহাশয় যদি এক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করতেন তবে বিষয়টি আরও বেশি চিত্তগ্রাহী হয়ে উঠত।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার মূল বৈশিষ্ট্য হলো প্রখর বাস্তবতাবাদ। তিনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মধ্যযুগের অমূল্য গ্রন্থের বাস্তবিক আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। একটি নিরপেক্ষ আলোচনা তখনই সম্ভব যখন একটি বিষয়ের দুটি দিক দেখানো হয়। কারণ আলো-অন্ধকার একে অপরের পরিপূরক। যেমন সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গালের আলোচনা প্রসঙ্গে 'নরনারী' প্রবন্ধে বলেছেন, "কবকঙ্কণ-চণ্ডীর সুবৃহতসমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থানুমাত্র এবং ধনপতি ও তাঁহার পুত্র কোনো কাজের নহে।"[২৩] এখানে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের আলোচনায় দুটি দিকের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রাবন্ধিক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র মধ্যযুগের অন্যতম কবি মুকুন্দরামের কাব্যের গুণ দেখিয়েছেন। আলোচনার দুটি দিকের প্রতি আলোকপাত করেননি। এক্ষেত্রে মনে হয় চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যধারার কবি মুকুন্দরামের প্রতি অতিরিক্ত সম্মানের ফলে তিনি মুকুন্দরামের কাব্যের সমালোচনা করার সময় অতিরিক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

চণ্ডীমঙ্গাল প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গাসাহিত্যের উপন্যাসে ধারা' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে বিশেষ বাক্য ব্যবহার করেছেন — "এই শ্রেণীর প্রধান কাব্য মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'তে স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তবচিত্রে, দক্ষচরিত্রাঙ্কনে, কুশল ঘটনাসন্নিবেশে, ও সর্বোপরি, আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধস্থাপনে, আমরা ভবিষ্যৎকালের উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাইয়া থাকি।"[২৪] অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে উপন্যাসের লক্ষণ আছে। এটা ঠিক যে রূঢ় সংসার জীবনের কিছু ছবি মুকুন্দরামের কাব্যে আমরা পেয়েছি, যেমন কালকেতু-ফুল্লরার সংসার জীবন ইত্যাদি। মাত্র এইটুকু নিদর্শনের জন্য (যার মধ্যে কবির আত্মপরিচয়-দান অংশটিকেও ধরে নিতে হবে) মধ্যযুগের কোনো কাব্য, উপন্যাস নামক আধুনিক মহাকাব্যের সমতুল হতে পারে কিনা এ সন্দেহ থেকে যায়। বস্তুত তার জন্য 'জীবন-রস-রসিকতা'র প্রয়োজন। মুকুন্দরামের কাব্যে তার অভাব থাকার জন্যই প্রমথনাথ বিশী মুকুন্দরামকে চণ্ডীমণ্ডপের কবির বেশি বলতে রাজি ছিলেন না। সেকথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আসলে জীবনের বহুবিধ মাত্রা, যন্ত্রণার উপল-উপকূলে আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হওয়া রক্তাক্ত মানুষের কাহিনি মুকুন্দরাম হয়তো ভেবেছিলেন। কিন্তু প্রকাশের উপযুক্ত আয়ুধ তাঁর ছিল না। এবং আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে জেনেছি 'প্রকাশই কবিত্ব।' ফলে আধুনিক জীবনের বহুমাত্রিক ব্যাপকতা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গালে সত্যই নেই। তিনি আবদ্ধ রয়ে গেছেন গ্রামীণ লেখকের সীমাবদ্ধতায়। আমরা বিস্মিত এই কারণেই যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ইংরেজি এবং বাংলা সাহিত্যের দেদীপ্যমান ব্যক্তিত্বও মুকুন্দরামকে আধুনিক ঔপন্যাসিকের সমগোত্রীয় করেছেন। যে শিরোপা পাবার জন্য মুকুন্দরাম উচ্চমানের কাব্য রচনা করতে পারেন নি, সেই শিরোপা তাঁকে দান করে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ মাতৃভাষার মধ্যযুগীয় কবির প্রতি অতিরিক্ত সম্মান জ্ঞাপন করেছেন। এই জায়গায় আমরা শ্রদ্ধেয় সমালোচকের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে পারিনি।

তবে সব সমালোচনাধর্মী কাজেরই সীমাবদ্ধতা থাকে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায় এই সীমাবদ্ধতা থাকলেও তিনি যেভাবে চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের আলোচনার মধ্য দিয়ে কালকেতু-ফুল্লরা আখ্যানের বিষয়বস্তুকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন তাতে যেমন বিষয় সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট জ্ঞান ও রুচিবোধ সম্পর্কে আমরা অবগত হই, তেমনই এই গ্রন্থের ভূমিকা পাঠ করে বইটির বিষয়ে আমাদের সম্যক ধারণা জন্মে। এই আলোচনায় যেমন তাঁর মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া গেছে তেমনই কবিকঙ্কণের কাব্য সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য এবং তাঁর বাস্তব দৃষ্টি গ্রন্থখানিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বইটির খুঁটিনাটি বিষয়ে পাঠক পরিচয় লাভ করেন। মধ্যযুগের কাব্য ধারায় মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গাল' আলোচনায় এখানেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থকতা।

তথ্যসূত্র:

১। 'বঙ্গাবীণা', ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও চারুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'পরিচয়' রবীন্দ্রনাথ, ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ, ১৯৩৪।

২। 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী', শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রিত ২০০২, পৃষ্ঠা ১২।

৩। ওই, পৃষ্ঠা ১৬।

৪। ওই, পৃষ্ঠা ২১।

৫। ওই, পৃষ্ঠা ২৩।

৬। ওই, পৃষ্ঠা ২৩।

৭। ওই, পৃষ্ঠা ৩১।

৮। ওই, পৃষ্ঠা ৩৭।

৯। ওই, পৃষ্ঠা ৪১।

১০। ওই, পৃষ্ঠা ৪২।

১১। ওই, পৃষ্ঠা ৪৩।

১২। ওই, পৃষ্ঠা ৪৩।

১৩। ওই, পৃষ্ঠা ১৮।

১৪। ওই, পৃষ্ঠা ২৬।

১৫। 'বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য', 'ভারতচন্দ্র', প্রমথনাথ বিশী, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১২, চতুর্থ সংস্করণ, কার্তিক ১৩৬৭, পৃষ্ঠা ৬২।

১৬। 'রবীন্দ্র রচনাবলী', সপ্তদশ খণ্ড, 'সাহিত্য', 'কাব্য: স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৭, পুনর্মদ্রণ পৌষ ১৪১৭, পৃষ্ঠা ২৪৬।

১৭। 'সমালোচনার কথা', অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট কলিকাতা ৭০০ ০৭৩, পুনর্মুদ্রণ ২০০২-২০০৩, পৃষ্ঠা ২৫।

১৮। 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', রামগতি ন্যায়রত্ন, হুগলী, বুধোদয় যন্ত্রে, কাশীনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত, সংবৎ ১৯৩০, পৃষ্ঠা ১০০।

১৯। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রথম ভাগ, দীনেশচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র সেন প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ২৫৭।

২০। 'বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য', 'ভারতচন্দ্র', প্রমথনাথ বিশী, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১২, চতুর্থ সংস্করণ, কার্তিক-১৩৬৭, পৃষ্ঠা ৬৫।

২১। 'রবীন্দ্র রচনাবলী', সপ্তদশ খণ্ড, 'সাহিত্য', 'বাঙালি কবি নয়', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৭, পুনর্মদ্রণ পৌষ ১৪১৭, পৃষ্ঠা ২২৫।

২১। ঐ, পৃষ্ঠা ২২৬।

২৩। 'পঞ্চভূত', 'নরনারী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৭, পুনর্মদ্রণ পৌষ ১৪১১, পৃষ্ঠা ৩৪।

২৪। 'বঙ্গাসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পুনর্মদ্রণ ২০১৬-২০১৭, পৃষ্ঠা ৮।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ:

১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রিত ২০০২।

২। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গাসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, পুনর্মদ্রণ ২০১৬-২০১৭।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সমালোচনার কথা', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট কলিকাতা ৭০০ ০৭৩, পুনর্মুদ্রণ ২০০২-২০০৩।

২। আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি. এবং সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, প্রথম যৌথ প্রকাশ মে ২০১৫।

৩। দীনেশচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র সেন প্রকাশিত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রথম ভাগ।

৪। প্রমথনাথ বিশী, 'বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য', 'ভারতচন্দ্র', বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১২, চতুর্থ সংস্করণ, কার্তিক ১৩৬৭।

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', সপ্তদশ খণ্ড, 'সাহিত্য', 'কাব্য: স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট', বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৭, পুনর্মদ্রণ পৌষ ১৪১৭।

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পঞ্চভূত', 'নরনারী', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৭, পুনর্মদ্রণ পৌষ ১৪১১।

৭। রামগতি ন্যায়রত্ন, 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', হুগলী, বুধোদয় যন্ত্রে, কাশীনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত, সংবৎ ১৯৩০।

৮। ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও চারুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'বঙ্গাবীণা', 'পরিচয়', ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ, ১৯৩৪।

৯। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'কবি ভারতচন্দ্র', মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭।

১০। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য', সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯, নবম মুদ্রণ আশ্বিন ১৪২৩।

লেখক পরিচিতি:

শেলি সাহা: পড়াশোনা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণা-রত। আসামের বঙাইগাঁও শহরের বীরঝরা কন্যা মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারি অধ্যাপিকা।

—